দেশ কাল মানুষের

নাগরিক

আজ কাল পরশু

প্রথম বর্ষ • ৫ ম সংখ্যা • ০৩ জুন ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- মানুষের আস্থা হারালো নির্বাচন কমিশন ২
- ভারত ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ৩
- রেমাল নিয়ে ভাবনাচিন্তা ৪
- বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব নয় ৬
- ২৭৯ পার করছে ইন্ডিয়া জোট ৮
- মোদির অনৈতিহাসিক বক্তব্য ৯
- কাজী নজরুল ইসলাম এক আধারে অনেককিছু ১০
- নেহরু ও প্যাটেল ১২
- ভারতীয় বিজ্ঞান-দর্শন চর্চার পথিকৃত অক্ষয় কুমার দত্ত ১৩
- শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত থামেনি ১৪

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

প্রধামন্ত্রীর নির্বাচন আর নির্বাচন কমিশন

প্রায় দু'মাসের দীর্ঘ নির্বাচনী যাত্রা শেষ হল। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এটাই ছিল দীর্ঘতম সাধারণ নির্বাচন। ইলেকটোরাল বন্ডের কালো টাকায় আমরা ভোট প্রচারের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা উড়তে দেখেছি। তেমনই খুব কাছ থেকে দেখার এবং চেনার সুযোগ হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। আবার এই প্রথম কার্যত প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত নির্বাচন কমিশন কীভাবে কাজ সামলেছে তাও দেখা গেল। নিবাচন দীর্ঘায়িত করা হয়েছে যাতে মোদী দেশের সর্বত্র প্রচার করার যথেষ্ট সুযোগ পান। গত দশ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে নরেন্দ্র মোদী দেশে বা বিদেশে কখনও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি। অথচ এবারের ভোটপর্বে দেশের অসংখ্য টিভি চ্যানেল আর সংবাদপত্রে অকাতরে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাংবাদিকের অবশ্য প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না। বারাণসীতে সেই রকমই এক টিভি সাক্ষাৎকারে মোদী বলে বসেন, মা মারা যাবার পর তিনি বুঝেছেন যে তাঁর জন্ম জৈবিক প্রক্রিয়ায় হয়নি। তাঁকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। তাই তাঁর এতো প্রাণশক্তি। কোন সাংবাদিক অবশ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করেননি যে তাঁর জন্ম তাহলে হল কী ভাবে! সব সীমা ছাড়িয়ে গেছেন মোদী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে আউড়েছেন। মোদী বলেছেন, কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছে তারা ক্ষমতায় এলে হিন্দু মহিলাদের সোনার গয়না আর মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দেবে। মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী এবং অধিক সন্তান উৎপাদনকারী বলে মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, কংগ্রেস হিন্দুদের গবাদিপশু কেড়ে নেবে। তফশিলি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ কমিয়ে তা মুসলমানদের দিয়ে দেবে। এমন প্রধানমন্ত্রী কেউ দেখেছেন, যিনি ভোটে জেতার জন্য নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেন? সবই নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে বিধি মেনে। নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শক। সুরাট, ইন্দোর ইত্যাদি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েছে বিজেপি। ২০১৪ সাল থেকে দেশের ৮০% মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের ক্ষমতা ধসে গেছে, বেকারিত্ব লাগামছাড়া। তা নিয়ে টুঁ-শব্দ করেননি প্রধানমন্ত্রী।

মানুষের আস্থা হারালো নির্বাচন কমিশন

অমিতাভ সিংহ

বিরোধী দলগুলির ক্রমাগত চাপে অবশেষে গত ২৫ মে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নির্বাচন কমিশন পাঁচ দফা ভোটের পরিসংখ্যান জনসমক্ষে নিয়ে এল। সেদিনটি ছিল ষষ্ঠ দফার ভোটের দিন। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জমা হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুবেলা ঘৃণা ভাষণ ও অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাওয়া সত্বেও কমিশন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যাক্তি কমিশনের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশন কয়েক দিন গড়িমসি করার পর 'নাম কা ওয়াস্তে' একটা কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠায় বিজেপি সভাপতি নড্ডার কাছে। এই চিঠি মোদীর কাছে পাঠানোর সাহস কেন হল না কমিশনের তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। গতবছর একই কাজ করে মোদী পার পেয়ে গিয়েছিলেন কমিশনের তিন সদস্যদের মধ্য মোদীর বশংবদ দুজন থাকার জন্য। অন্য একজন নিরপেক্ষ সদস্য অশোক লাভাসা বারবার মোদী ও অমিত শাহের ক্রমাগত ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট ভাষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। প্রতিবারেই তা ২-১ ভোটে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। কমিশনের অন্যতম সদস্য অশোক লাভাসা বিতশ্রদ্ধ হয়ে কমিশন ছেড়ে চলে যান। আর এবারে তো নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য তিন সদস্য কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঢুকিয়ে কমিশনের পুরো নিয়োগ নিজের হাতে নিয়েছেন। তিন সদস্যই এখন মোদী বা বিজেপির বশংবদ। তারা আশঙ্কা করছে মোদী তথা বিজেপির পরাজয়ের। কিভাবে তারা চুপ করে বসে থাকে? আরএসএসের পরিকল্পনামত তারা নেমে পড়েছে অনৈতিকভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোলে।

তার মূল দিকটা এবার দেখা গেল ভোটের চূড়ান্ত পরিসংখ্যানে কারচুপি। এবারের ভোট মোট সাতটি পর্বে অনুষ্ঠিত হল; এপ্রিল মাসের ১৯ ও ২৬ তারিখে, মে মাসের ৭, ১৩, ২০ ও ২৫ তারিখে এবং জুনের ১ তারিখে। প্রথম পর্বের নির্বাচন শেষ হওয়ার ১১ দিন পর ও দ্বিতীয় দফার ৪ দিন পর ওই দুই দফার চূড়ান্ত ভোটের হার প্রকাশ্যে আনে কমিশন। দেখা গেল দুটি পর্বে ভোটের প্রাথমিক হার বলে কমিশন যা জানিয়েছিল তার থেকে ছয় শতাংশ ভোট বেড়েছে। এটাই সন্দেহ করার জন্য যথেষ্ট নয় কি? এবিষয়ে কমিশন যুক্তি দিয়েছে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে চূড়ান্ত হিসাব আসতে দেরী হওয়া, গরমের জন্য শেষবেলায় এসে ভোটারদের লাইনে দাঁড়ানো বা নির্ধারিত সময়ের পর ভোট গ্রহণের মত হাস্যকর ও বালখিল্য কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছে। আগে তো এতবার লোকসভা বা রাজ্যগুলিতে বিধানসভার অসংখ্যবার ভোট হয়ে গেছে।

> "কমিশন ভুলে গেছে যে তারা সরকারের অধীনস্থ কোনও সংস্থা নয়, সরকার বাঁচানোর বদলে তাদের দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচানো প্রধান কর্তব্য।"

তখন পরিসংখ্যান জানাতে এত দেরী বা প্রাথমিকের সাথে চূড়ান্ত পরিসংখ্যানের এত পার্থক্য হত না কেন? তখন দেশে গণতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় ছিল বলে? নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে শুধু বিরোধী দলগুলিই নয় বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে, কমিশন শাসকদলকে প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে নানারকম সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। কমিশন ভুলে গেছে যে তারা সরকারের অধীনস্থ কোনও সংস্থা নয়, সরকার বাঁচানোর বদলে তাদের দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচানো প্রধান কর্তব্য। কিন্তু কত ভোটার ভোট দিলেন তা প্রকাশের ব্যাপারে এত অস্বচ্ছতা দেখাচ্ছে কেন? প্রথমে তারা তথ্য দিয়েছিল রাজ্যভিত্তিক, শতাংশ হিসাবে। বেশ কয়েকদিন পর তারা যা হিসাব দিল তাতে প্রতিটি রাজ্যের গড় ভোট বেড়ে গেল প্রায় ৬ শতাংশ। চার পর্বের ৩৮১ টি আসনের নির্বাচনের পর কংগ্রেস অভিযোগ করে মোট এক কোটি সাত লক্ষ ভোট বেশী দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ সংসদীয় কেন্দ্র পিছু ২৮ হাজারেরও বেশী ভোট বাড়া। যে কোন প্রার্থীর পক্ষে তা আশীর্বাদস্বরূপ নয় কি? এই পরিবর্তিত হিসাব বা বৃদ্ধি তামিলনাড়ু ও বাংলার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪৬ ও ২৪ লক্ষ যা কেন্দ্রপিছু লক্ষাধিক। এই দুটি রাজ্যে যথেষ্ট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

হচ্ছে বলে খবর।

এই হিসাব গরমিলের ব্যাপারটি নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে মন্তব্য করেছিলেন। রাহুল গান্ধী তো অনেকদিন ধরেই ব্যালটের মাধ্যমে ভোট করার সওয়াল করছিলেন ও ইভিএমের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু খার্গের মন্তব্যের পাল্টা নির্বাচন কমিশন যেভাবে এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিক্রিয়া জানায় তা শুধু অভূতপূর্ব নয় অবাঞ্ছিত। দেশের সবথেকে প্রাচীন ও সবথেকে বেশী সময় দেশ চালানো দলটির সভাপতিকে এই ধরনের দোষারোপের জন্য প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

বিরোধীসহ এডিআর বা অ্যাসোশিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস সুপ্রীম কোর্টে আর্জি জানায়, বুথপ্রতি ভোট পড়ার হিসাব সংক্রান্ত ১৭ সি ফর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করুক কমিশন। প্রতিটি বুথে প্রতিটি দলের তো বটেই প্রতিটি প্রার্থীর এজেন্ট থাকতে পারে। নির্বাচনের পর প্রিসাইডিং অফিসার এই ফর্মের মাধ্যমে ওই বুথে কতজন ভোটার আছে, কতজন ভোট দিয়েছে, কতগুলি টেন্ডার ভোট দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি দেওয়া থাকে। একটি কেন্দ্রের সবকটি বুথের ফর্ম ১৭ সি একত্র করে তা যোগ করলেই কতজন ভোট দিয়েছে তা বার করা খুবই সহজ। কিন্তু কমিশন তা প্রকাশ করতে চায়নি নানা অজুহাতে। এটা কোন গোপন নথি তো নয়, বিশেষ করে ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে। এর ফলে কোন বুথে কত ভোট পড়েছে তা জানা যেত। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনকে কোন নির্দেশ দিতে রাজী হয়নি। তাঁদের যুক্তি, নির্বাচনের মাঝপথে রায় দেওয়া যায় না।

কিন্তু কংগ্রেসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি (বিজেপি ও তাদের সহযোগী দলগুলি বাদে) বার বার মোট ভোটদান সংক্রান্ত তথ্য জানাতে চাপ সৃষ্টি করেছে নির্বাচন কমিশনের ওপর, সাধারণ মানুষের অবিশ্বাস ও সন্দেহ কাটানোর জন্য। কমিশন তা দিতে অস্বীকার করে অবিশ্বাসের পাত্র হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অনেক দেরিতে ৬ শতাংশ বৃদ্ধিসহ যে হিসাবটি প্রকাশ করে তাতে কি অবিশ্বাসের বাতাবরণের নিষ্পত্তি হয়েছে?

ভারত ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে তার বিশেষ উদাহরণ স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী ভাষণগুলিতে। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিভূ হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তাদের জন্মলগ্ন থেকেই ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ও দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করে চলেছে। নরেন্দ্র মোদী খুব সচেতন ভাবেই গত মার্চ মাসে রাহুল গান্ধী ও লালুপ্রসাদ যাদবের মাংস রান্না করা নিয়ে বলেন, 'চৈত্র মাসে মাছ মাংস খাওয়া মোগল মানসিকতার পরিচয়।'

রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করবার আগে ও পরে হিন্দুত্ববাদী ধর্মান্ধ শক্তি প্রথম হস্তক্ষেপ করে ইতিহাসের পাঠক্রমের ওপর। দেশের গৌরবগাথা প্রচারের নামে তারা ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচার করে। উদ্দেশ্য মিথ্যা কল্পকাহিনীকে ইতিহাস বলে চালানো ও মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ গত ২০২২ এর ১০ জুন দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, তাঁর দল এইবার ইতিহাস লিখবে। তাঁদের ইতিহাস লেখার স্বাধীনতা আছে। শাহ বলেন, তাঁদের এই প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। শ্রীশাহ ওই দিন উদয়পুরের নৃপতি মহারাণা প্রতাপ সিংহের ওপর লেখা 'মহারাণা সহস্র বর্ষ কা ধর্মযুদ্ধ' নামের একটি বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ১৫৭৬ সালের ১৮ জুন হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবর বাদশার সেনাপতি ছিলেন অম্বর রাজ মান সিংহ, তিনি হিন্দু। আর মহারাণা প্রতাপের পক্ষে অন্যতম সেনানি ও যোদ্ধা ছিলেন একজন মুসলমান হাকিম খাঁ শুর, পাঠান। ইনি জীবন দিয়ে মহারাণা প্রতাপের জীবন রক্ষা করেন। এই যুদ্ধের সঙ্গে ধর্মের কী সম্পর্ক? এ তো দুই সামন্ত নৃপতির যুদ্ধ। তবে বৃহৎ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে সাহসী মহারাণা প্রতাপের প্রতিরোধে আমাদের সহানুভূতি তাঁর দিকে। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

অমিত শাহ ওই সভায় বলেন, 'ইতিহাস লেখার দায় সরকারের নয়। ইতিহাস লেখার দায়িত্ব ঐতিহাসিকদের। কিন্তু এতদিন যে সব ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা

মোগলদের ও অন্যান্য বিদেশি আক্রমণকারীদের বীরত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের কথা লেখেননি। অমিত শাহ যে অভিযোগগুলি করেছেন সেগুলি সঙ্ঘ পরিবারের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। কিন্তু ওই আজগুবি অভিযোগগুলি সর্বৈবভাবে অসত্য এবং ভিত্তিহীন প্রচার। বিদ্যালয় স্তর থেকেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্বে মৌর্য, পান্ড্যত, গুপ্ত, পল্লব, চোল, চালুক্যল, রাষ্ট্রকুট, কনৌজ, প্রতিহার, কলচুরি, কামরূপ, অহম প্রভৃতি সকল রাজবংশের ইতিহাসই পড়ানো হয়। মনে রাখতে হবে এদের মধ্যে শুধুমাত্র মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশ তাদের রাজত্বের সীমা বর্তমান ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ অংশে প্রসার করতে সক্ষম হয়। বাকি রাজবংশগুলির প্রভাব ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে কোনো রাজবংশই নীরবচ্ছিন্নভাবে হিন্দুধর্ম অনুসরণ করেনি। ওই সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও প্রসার লাভ করেছিল। অনেকে ওই দুই ধর্মের অনুগামী হয়েছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর শাসন কালের পরও সহস্র বছর পর্যন্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় রাজা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজবংশের কথাও ছাত্রদের পড়তে হয়। পাল রাজাদের সময় বাংলায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তার বহু স্বাক্ষ্য এখনও ছড়িয়ে আছে।

এই সব অমিত শাহ জানেন কি? তাঁর পড়াশুনো কি নিয়ে? স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে যারা প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাস পড়েন তাঁরা আরো বিশদ ভাবে পাঠ গ্রহণ করেন। এসব অমিত শাহরা জানেন না? তাঁদের মতের সঙ্গে ইতিহাসের জ্ঞান চর্চার কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা মধ্যযুগের সামন্ত নৃপতিদের অর্থাৎ রাজা বাদশাদের রাজ্য বিস্তারের জন্য সংঘর্ষকে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ বলে চালানোর চেষ্টা করছেন। ইতিহাস পাঠের কোনও রকম প্রশিক্ষণ অর্থাৎ (chooling) থাকা সত্বেও এরা সকলেই ঐতিহাসিক। ২০২৩ সালের ১৫ জানুয়ারি দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সিডি দেশমুখ স্মারক বক্তৃতায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার পেশাদার, প্রশিক্ষিত ইতিহাসবিদদের সঙ্গে বানানো গল্প, রূপকথাকে ইতিহাস বলে চালানো দলের যে পার্থক্য, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বৈদিক অঙ্কের গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে মাতামাতি খারিজ করে দিয়ে বলেছেন, বৈদিক অঙ্কের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার মতন কোনও কারণ নেই। বহুদিন আগে প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তি 'সবই ব্যাদে আছে' নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে রয়েছে!

সঙ্ঘ পরিবারের পুরোধারা যথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত; সকলেই জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের 'গৌরবময় অতীত' তুলে আনার কথা বলে চলেছেন। রোমিলা থাপার তাঁর ওই স্মারক বক্তৃতায় ইউরোপের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এরিক হপসবমের বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন। হপসবম বলেছিলেন, 'ইতিহাসের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক আর আফিমের সঙ্গে হেরোইন আসক্তির সম্পর্কটা একই রকম। আফিমের নেশা যখন মাথায় চড়ে, মাদকাসক্ত তখন গৌরবময় অতীত নিয়ে রূপকথার জাল বুনে চলে।'

(চলবে)

রেমাল নিয়ে ভাবনাচিন্তা

দীপায়ন দে

রেমাল, একটা শক্তিশালী সাইক্লোন, চলে গেল পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে। সকলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল 'এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম'। মূলত যারা উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা বা সাগরের খুব কাছাকাছি যাদের বাস, এমনকি শহরাঞ্চলের মানুষ, তারা সকলেই সাইক্লোনের গতিপথের দিকে গত দু-তিন দিন তাকিয়ে বসেছিলেন। এখন এন্ড্রয়েড ফোনে অনেক এমন অ্যাপ পাওয়া যায়, যাতে বোঝা যায় সাইক্লোন কোথায় কখন কিভাবে আছড়ে পড়বে। সাবধান হওয়া যায়। অন্যকেও সতর্ক করে দেওয়া যায়। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বিভিন্ন জায়গায়, সেই প্রাচীন সময় থেকেই কিন্তু মানুষ সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝাকে সঙ্গে করেই জীবনযাপন করেছেন। অবিভক্ত বাংলা, উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তির্ণ এলাকা ঝড়বৃষ্টির প্রকোপে তছনছ হয়েছে

বারম্বার। বর্তমান সময়ে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং হাতফোনের দৌলাতে ঝড়ের খবর একেবারে বুকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় খুব সহজই। কিছুটা গুজবও ছড়ায় মানুষ। এখন নিম্নচাপ, আবহাওয়া সতর্ক বার্তা, অরেঞ্জ এলার্ট; এসব বিষয়গুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আমরা। ৬০-৭০ বছর আগে এমনটা ছিল না। এই সব ঝড়-ঝঞ্ঝাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবেই মানুষ মেনে নিত। কিন্তু ইদানিং আরেকটা বিষয় সবার মাথায় চেপে বসেছে, ঝড়ের খবর এলেই সবাই সন্দেহ করে যে এটা নিশ্চয়ই জলবায়ু পরিবর্তনের জের। অথবা নির্ঘাত বিশ্বউষ্ণায়ন। একটু বোঝা দরকার যে সত্যিই কি তাই, আর যদি তাই হয় তাহলে সহনাগরিক হিসেবে আমাদের কি করনীয়।

১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে ফিবছরই একটা বা দুটো সামুদ্রিক ঝড় বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তৈরি হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সাংঘাতিক ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছিল মেদিনীপুরের তটবর্তী এলাকা এবং প্রায় পাঁচশোর বেশি প্রাণহানি হয়েছিল সেই ঝড়ে। তারপর প্রতি বছরই ছোটখাটো এবং কিছু বড়সড় ঝড় বা নিম্নচাপ এই অঞ্চলে তৈরি হয়। এখানে দুটো বিষয় আমাদের আলোচ্য; প্রথমত, বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে ঝড়ের প্রকোপ এত বেশি কেন? এবং দ্বিতীয়ত, সত্যিই কি জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতি মাত্রায় বেড়ে গেছে? প্রথম বিষয়টা বলি, বঙ্গোপসাগর অনেক বেশি প্রশস্ত এবং আরব্য সাগরের তুলনায় বঙ্গোপসাগরের জল কিছুটা বেশি গরম, যার ফলে বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠতলে বাষ্পায়নের পদ্ধতি খুব দ্রুত ঘটে এবং তা বিপুল পরিমাণে বাষ্পীকরণে সাহায্য করে। এরই জন্য সাগরের উপরি স্তরের বায়ু গরম হয়ে আরো উপরে উঠে গেলেই তৈরি হয় নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্ত। যা কিনা সাইক্লোনের রূপ নেয়। এর সাথে বঙ্গোপসাগরের জ্যামিতিও খুব তাৎপর্য্যপুর্ণ। এই সাগরের জল তিন দিকে স্থলভূমি দিয়ে ঘেরা। তার ফলে জমির উষ্ণতা এই বাষ্পীকরণকে দ্রুততর করে তোলে, এবং এর দরুণ যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয় তাও দুই ধারের ভূমির কিনারায় ধাক্কা খেতে খেতে ত্রিকোণ ফানেলের মত এসে আছড়ে পড়ে ঠিক সুন্দরবন উপকূলবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের তটবর্তী অঞ্চলে।

ঝড় এবং ঝঞ্ঝা এই দুয়েরই আঁতুরঘর বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত। বারবার বঙ্গদেশেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এযাবত্কাল। স্বাধীনতার পর আমরা অবশ্য খানিকটা নিশ্চিন্ত তা নিয়ে। বলি যে, যাক এবারের ঝড় বাংলাদেশের দিকে চলে গেছে। জানি না, স্বাধীনতার আগে এই নিশ্চিন্ততা আমাদের ছিল কিনা। তবে ঝড় যেখানেই যাক তার দুর্ভোগ যে-মানুষেরা ভোগেন, তাঁরা হতদরিদ্র, কিয়দংশে অক্ষম এবং তাঁরা প্রান্তিক চাষিবাসি মানুষ। আয়েলা, আম্ফুন বা ইয়াসের স্মৃতি আজও আমাদের ঘুমাতে দেয় না। কিন্তু সুপার-সাইক্লোন কোমেন (২০১৫), রুয়ানু (২০১৭) বামোরা (২০১৮) যাতে বাংলাদেশের ৫১ হাজার মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছেন, অথবা বুলবুল বা ফনি যা কিনা বাংলাদেশের পুরো তটবর্তী অঞ্চল ছারখার করে দিয়েছিল, তা হয়তো তেমন ভাবে আমাদের স্মৃতিতে নেই। প্রসঙ্গত বলে রাখি, রেমালের প্রতাপে বাংলাদেশে আজ ঘরছারা প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ, পটুয়াখালি প্রায় খালি হয়ে গেছে, পুনর্বাস নিয়েছেন প্রায় ৮ লক্ষ নরনারী। সাতক্ষিরায় কত যে খয়খতি হোল তার হিসেব নেই। তবু আমরা ভাল আছি তুলনামুলক ভাবে।

এইবার একটু অন্য কথায় আসি, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই ঝড়-ঝঞ্ঝা আগের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বেড়েছে, অথবা কিছুটা বা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এর চরিত্র। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর ভৌগলিক তাপমাত্রা সাধারণের চেয়ে আরো প্রায় আড়াই ডিগ্রি বেশি হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। যার জন্য আমাদের দক্ষিণ গোলার্ধে মৌসুমী বায়ু এবং সেই মৌসুমী বায়ুর পরিচালন ভঙ্গি যা কিনা বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় 'এল নিনো'; সেই এল নিনো বাম থেকে দক্ষিণে সরতে আরম্ভ করেছে। জানি না, এল নিনো রাজনীতি করে কিনা, তবে এই বাম থেকে দক্ষিণে অবহেলনের ফলে আমাদের ঋতুচক্রে কিছু অভিনব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। সেই পরিবর্তনের মধ্যে একটা অন্যতম পরিবর্তন হলো, বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং নিম্নচাপ এখন সহজেই অতি গভীর রূপ ধারণ করে এবং সাংঘাতিক ধ্বংসলীলায় পটু হয়ে ওঠে। এই বারে রেমালের কথা বলি। সাধারণত এই ধরনের নিম্নচাপ অতীতে মৌসুমীবায়ু এবং বর্ষাকে ঠেলে নিয়ে আসতো গাঙ্গেয় সমতল ভূমিতে। বর্ষা নামতো। ধান রুইতো চাষী। অন্নের সংস্থান হতো মানুষের ঘরে

ঘরে। রেমাল কিন্তু অনেকটাই ব্যতিক্রমী। তার কারণ, সে মৌসুমী বায়ুকে কিছুটা অগোছালো করে দিয়েছে, যার ফলে হয়তো আগামী দিনে বর্ষার চরিত্রও কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। একই সাথে, এই ধরনের নিম্নচাপ বা সাইক্লোন এতবড় আকারে এবং বছরের এই সময় আগে সচরাচর দেখা যায়নি। রেমালের ব্যাস ছিল প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। অতএব, এক কথায় একটু সহজ করে বললে অন্যথা হবেনা যে বঙ্গোপসাগরের উপর বিশ্বউষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আমাদের জন্য খানিকটা দুর্ভোগ বাড়িয়েছে বৈকি। কিন্তু আরেকটা বিষয়ও এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। সেটা হল, বঙ্গোপসাগরের এই যে তিন দিকের স্থলভূমি, তাতে নগরায়ন, কংক্রিটের জঙ্গল, বাদাবনের উচ্ছেদ এবং আসল জঙ্গলের উৎপাটন, যা কিনা মানুষের সভ্যতার পদচিহ্ন; তারই ফলে এই অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে আরো কয়েকগুণ। জলবায়ু বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয়, 'হিট আইল্যান্ড এফেক্ট'। এই জন্যই মাঝে-মধ্যে স্থলভূমির বাতাস উষ্ণতর হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ও সুপার-সাইক্লোন হুহু করে টেনে আনে জমির স্থলভাগের উপরকার নিম্নচাপ। তাই, আজ যা ঘটছে তার অনেকটাই যদি প্রাকৃতিক হয় তাহলে কিছুটা দায় তো আমাদের সভ্যতার উপরেও বর্তায়। এখন কি আর বলা যায় 'দাও ফিরে সে অরণ্য'? সে সময় আর নেই আমাদের হাতে।

বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব নয়

সৌর বসু

লোকসভা নির্বাচনের শেষ পর্ব পয়লা জুন অনুষ্ঠিত হল এবং ৪ জুন ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এখন কে ক্ষমতায় আসবে তা অনুমান করা কঠিন। গত দুই লোকসভায নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে। ২০১৪ সালে বিজেপির স্লোগান ছিল 'সবকা সাথ সব কা বিকাশ'। ২০১৪ সালে বিজেপি উন্নয়নমূলক ইস্যুগুলির ভিত্তিতে লড়াই করেছিল। মোদী বলেছিলেন, তিনি কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন এবং প্রতি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা জমা দেবেন, কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি। তার উপরে মোদী বাজার থেকে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট প্রত্যাহার করে নেন। এতে হতদরিদ্র মানুষদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কালো টাকা উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছে মোদী সরকার। প্রতি বছর ২ কোটি বেকারের চাকরিও তিনি দিতে পারেননি। ২০১৯ সালে বিজেপি সরকার লোকসভায় ৩০৩ টি আসন পেয়েছিল এবং এনডিএ ৩৩৩ টি আসন পেয়েছিল। ২০১৯-এ তাদের আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিজেপি ৩৭% ভোট পায় এবং অবশিষ্ট ৬২% ভোট এনডিএ-এর বিরুদ্ধে গিয়েছে। ২০১৪ সালে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। ইউপিএ-র দ্বিতীয় পর্বটি ছিল দিশাহীন এবং প্রশাসনে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ ইউপিএ-তে বিশ্বাস হারিয়ে বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নরেন্দ্র মোদীর সরকার আরও নির্লজ্জভাবে সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলতে শুরু করে। সংখ্যালঘুদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। বজরঙ্গ দলের সদস্য ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আইন হাতে তুলে নেয় এবং মিথ্যা অভিযোগে রাস্তায় বা ট্রেনের করিডোরে সংখ্যালঘুদের পিটিয়ে মারার মতো অপরাধ ঘটে। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল অবধি বামফ্রন্ট ইউপিএ-র সঙ্গে ছিল। বামফ্রন্ট ইউপিএ সরকার থেকে বেরিয়ে আসার পর, তাদের অবস্থা হাল ভাঙা নাবিকের মত হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ইউপিএ সরকারের ওপর আস্থা হারায়। ৩১% ভোট পেয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হয়।

২০১৪ সালের আগে উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরে পরিকল্পিত দাঙ্গার ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি সরকার উত্তরপ্রদেশের আশিটি আসনের মধ্যে ৭১ টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। ২০১৯ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল উগ্র দেশপ্রেমের জোয়ারে ভেসে। বালাকোটে বোমা বর্ষণ এবং কাশ্মীরে পুলওয়ামায় ৪৭ জন সিআরপি জওয়ানের মৃত্যুকে কাজে লাগিয়ে ভারতের মানুষের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। উগ্র জাতীয়তাবাদকে সুকৌশলে ব্যবহার করে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। ২০২৪ সালে সেই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি যা নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে পারবে। রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মোদীজীর ভোটব্যাঙ্ক

বৃদ্ধি করবে এ ব্যাপারে প্রশান্ত কিশোরের মত প্রো-বিজেপি নির্বাচন কুশলীও নিশ্চিত নন।

অন্যদিকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভরসা যোগ্য নয়। জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী, চাকরির বাজারে হাহাকার, শিল্পে বিনিয়োগের খরা। মোদীজি যতই ট্রিলিয়ন অর্থনীতির গল্প শোনান অথবা ভারতের অর্থনীতিকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম বলে বড়াই করুন, ভারতের নিরন্ন মানুষ অভুক্তই থেকে গেছে। ভারতের অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারতের অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্রিটিশ যুগের থেকেও বর্তমানে অনেক বেশি। ভারতে বিলিনিয়ারদের সম্পদ বিগত এক দশকে দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্নীতির ক্ষেত্রে মোদীজি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংস্থায় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর দল পাঠিয়ে একার হাতে দুর্নীতিকে দমন করার যে বার্তা দিচ্ছেন, তা কতদূর গ্রহণযোগ্য, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রোডাকশন ইনডেক্স দেখলেই তা জানা যাবে। ২০১৪ সালে মোদীজি ক্ষমতায় আসার সময় ওই ইন্ডেক্স অনুযায়ী ভারতের স্থান ছিল ১৮০ টি দেশের মধ্যে ৯৪ তম। বর্তমানে তা আরো আট ধাপ নিচে নেমে গেছে।

অন্যদিকে মোদীজীর আমলে গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়ে চলেছে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মোদীজি তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছেন। লোকসভায় কে জয়ী হবে; নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত এনডিএ নাকি ২৪ টি দলের জোট ইন্ডিয়া, এটা এখন একটা বড় প্রশ্ন। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কি বলছেন একবার আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। প্রশান্ত কিশোর, যিনি ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁর মতে বিজেপি পুনরায় গদি দখল করবে। গত ২০১৯ নির্বাচনে বিজেপি একা পেয়েছিল ৩০৩ টি আসন। প্রশান্ত কিশোরের অনুমান অনুযায়ী, বিজেপি সমসংখ্যক আসন ধরে রাখতে পারবে। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে বিজেপির আসন সংখ্যা কমতে পারে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত তার মত অনুযায়ী সেই ঘাটতি পুষিয়ে দেবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেন্দ্র যাদব বলেছেন, বিজেপির এবার আসন সংখ্যা গত লোকসভা নির্বাচনের থেকে অন্ততপক্ষে ৫০ টি কমবে। অর্থাৎ ২৫৩টি আসন বিজেপি এবার পেতে পারে। বিজেপির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যদি আরো বৃদ্ধি পায় তাহলে হয়তো আরো ১৫-২০ আসন কমে যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জোট সঙ্গীসহ ২০১৯-এ ৮০টির মধ্যে ৬৪টি আসন পেয়েছিল। এবার উত্তরপ্রদেশে বিজেপি আসন সংখ্যা তাঁর মত অনুযায়ী আরো দশটি কমে যেতে পারে। এর অন্যতম কারণ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি এবং দলিতদের আনুগত্য বহুজন সমাজ পার্টি থেকে সমাজবাদী পার্টির দিকে সরে যাওয়া। হিন্দি বলয়ের চারটি রাজ্যে; রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড় এবং ঝাড়খন্ড; বিজেপি ২০১৯ সালে ৭৯টির মধ্যে ৭৪ টি আসন পেয়েছিল। ২০২৪ এর নির্বাচনে কতগুলি আসন বিজেপি পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। যোগেন্দ্র যাদবের অনুমান, বিজেপি এবার কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে এই প্রথম আসন পেতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম পার্টি ১৫ টি আসন পেতে পারে। তেলেগু দেশমের সঙ্গে বিজেপির জোট হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিজেপির লাভবান হবার সম্ভাবনা। মহারাষ্ট্র এবং বিহারে বিজেপির আসন (৪২ ও ৩৯) এবার যথেষ্ট কমতে পারে।

এছাড়া গুজরাটে গতবার ২০১৯-এ বিজেপি ২৬ টি আসনই পেয়েছিল, এবার তার পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা কম। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে যোগেন্দ্র যাদব কোন অনুমানে যেতে রাজি হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গে ২০১৯-এর অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হবে বলে তার মনে হয় না। তাঁর মতে বিজেপি তার জোট সঙ্গীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ২৮০ টির বেশি আসন পাওয়ার মত জায়গায় নেই। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে বিজেপি কত আসন পাবে তার উপর নির্ভর করছে বিজেপির ভবিষ্যৎ। হিন্দি বলয়ে বিজেপির আসন বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা নেই, কমে যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রশান্ত কিশোর এবং যোগেন্দ্র যাদব সহমত পোষণ করেছেন। মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা এবার ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিয়েছে। ফলে এবার মহারাষ্ট্রের সমীকরণ আলাদা। এছাড়াও প্রণয় রায়ের রিপোর্ট অনুসারে মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার নেতিবাচক ফল এসে

পড়েছে মহারাষ্ট্রে কৃষকদের উপর। মহারাষ্ট্রের শিল্পের অবনতি হয়েছে। এক সময় মহারাষ্ট্র শিল্পে ভারতের দ্বিতীয় স্থানে ছিল, বর্তমানে মহারাষ্ট্র স্থান দশম। মহারাষ্ট্র সাধারণ মানুষের মনে ধারণা জন্মেছে, নরেন্দ্র মোদীর সরকার গুজরাটের প্রতি যতটা সদয় মহারাষ্ট্রের প্রতি ততটা নয়। এই সমস্ত কারণে মহারাষ্ট্রে বিজেপির ভালো ফল করার সম্ভাবনা কম।

৪ জুন ফলাফল ঘোষণা হবে। বিজেপি সরকারের ১০ বছরের শাসনে যেভাবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছে, গণতন্ত্রের পরিসর সংকুচিত হয়েছে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তারপরেও ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হবে।

২৭৯ পার করছে ইন্ডিয়া জোট

নিজস্ব প্রতিবেদন : একটি খুব বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার মতে যারা অতীতে বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করেছে, তাদের সমীক্ষায় গোটা দেশে ইন্ডিয়া জোটের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা

উত্তরপ্রদেশ ৩৬, বিহার ২২, পশ্চিমবঙ্গ ২৯, মহারাষ্ট্র ৩১, তামিলনাড়ু ৩৯, কেরালা ২০, কর্ণাটক ১৯, পাঞ্জাব ১২, দিল্লি ৪, হরিয়ানা ৬, তেলেঙ্গানা ১২, রাজস্থান ১২, গুজরাট ২, ছত্তিশগড় ৪, ঝাড়খণ্ড ৬, হিমাচল প্রদেশ ২, আসাম ৫, উত্তর-পূর্ব ৪, ওড়িশা ৩, জম্মু ও কাশ্মীর ২, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৪, অরুণাচল প্রদেশ ১, মধ্যপ্রদেশ ৪,

ইন্ডিয়া জোট সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে সামান্য বেশি আসনের কাছাকাছি; ২৭৯টি আসন পাবে। এই সমীক্ষা অনুসারে, তফশিলি জাতি উপজাতি, সংখ্যালঘু এবং কৃষক সম্প্রদায় ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। চাকরির প্রতিশ্রুতির কারণে প্রথম বারের ভোটারদের প্রথম পছন্দ ইন্ডিয়া জোট। সমীক্ষা অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের সমর্থনের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জোট ১৮% এগিয়ে আছে। ৪৮-৬৫ বয়সীদের কাছে ইন্ডিয়া জোট ৭%এগিয়ে। মহিলা ভোটাররা ইন্ডিয়াকে বেছে নিয়েছে দক্ষিণে, উত্তরপ্রদেশে, ইন্ডিয়ার চেয়ে ২% বেশি মহিলা এনডিএ-কে ভোট দিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশে ২০২৩-এর বিধানসভার তুলনায় মহিলাদের ভোটদানে সবচেয়ে নাটকীয় পতন হয়েছে, যা বিস্ময়কর ফলাফল দিতে পারে। রাজপুত সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ এবং ভাল প্রার্থী নির্বাচন ১০ বছর পর গুজরাটে অ্যাকাউন্ট খুলতে কংগ্রেসকে সাহায্য করতে পারে।

মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ১ লক্ষ টাকা, ৩০ লক্ষ সরকারি চাকরি, প্রথম গ্যারান্টিযুক্ত চাকরি উত্তরপ্রদেশে ভোট বাড়িয়েছে। তেজস্বির প্রচার ১৭ মাসের ট্র্যাক রেকর্ড এবং চাকরির প্রতিশ্রুতি ইন্ডিয়াকে বিহারে অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। কম উচ্চকিত প্রচার এবং পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণ তেমন না-হওয়ায় বিজেপির আসন সংখ্যা কমবে। তাছাড়া বামপন্থীদের উত্থানও বেশ কয়েকটি আসনে বিজেপিকে ৩ নম্বরে ঠেলে দিয়েছে।

ওড়িশায় ২০১৯-এর ফলাফলের পুনরাবৃত্তি দেখতে পারে কংগ্রেস; গত নির্বাচনের তুলনায় বালেশ্বর এবং নবরংপুর, আরও দুটি আসন জিতছে। কাডাপা থেকে নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাজ্য কংগ্রেস প্রধান ওয়াইএস শর্মিলা রেড্ডির মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে কংগ্রেস।

বিজেপির ব্যাপক মেরুকরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং বিজেপিকে পাঁচের নিচে রেখেছে। গ্যারান্টি বাস্তবায়ন এবং কর্ণাটকে মহিলাদের একতরফা ভোট দেওয়ার অগ্রাধিকার কংগ্রেসকে ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৮ টি আসনের ২৫ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দেবে।

ইউডিএফ কেরালায় আবারও ১৮টি আসন জিততে পারে এবং এলডিএফ দুটি জিততে পারে। তবে উভয় পক্ষই ইন্ডিয়া জোটে আছে।কেরালায় বিজেপির অ্যাকাউন্ট খোলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেতে পারে। ত্রিশুর থেকে সুরেশ গোপী গতি বজায় রাখতে না পারলে।

তামিলনাড়ুতে বর্তমান সংসদ সদস্য এবং রাজ্য সরকারের কারণে ইন্ডিয়া জোটকে দ্বিগুণ অ্যান্টিইনকমবেন্সির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু সে রাজ্যের মহিলাদের ভোটারদের আনুকুল্যে ইন্ডিয়া জোট ভাল জায়গাতেই আছে। তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির ইন্ডিয়া জোট ৪০ টি আসনের মধ্যে

৩৮ টি জিততে পারে, এডিএমকে তার ভোট খানিকটা বাড়িয়েছে , তবে জাতীয় জোটের অনুপস্থিতির কারণে আসন বাড়েনি।

উদ্ধব ঠাকরে এবং শরদ পাওয়ারের প্রতি সহানুভূতি সহ বিভিন্ন কারণে মহারাষ্ট্র ইন্ডিয়ার বড় উত্থান দেখেছে এবং কংগ্রেসের প্রচারও ছিল কৌশলগত। মনোজ জারেঙ্গের নেতৃত্বে মারাঠা বিক্ষোভগুলিও বিজেপির বিরুদ্ধে মারাঠাদের একত্রিত করে। তফশিলি জাতির যারা গতবার প্রকাশ আম্বেদকরকে সমর্থন করেছিল তারা বেশিরভাগই এবার ইন্ডিয়া জোটকে ভোট দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ভারত জোট উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে সহ প্রতিটি রাজ্যে মোটামুটি ভাল করেছে, এই রাজ্য গুলির সংখ্যা দেশের ৫৪৩ টি আসনের মধ্যে ২১০ টি আসন।

মোদির অনৈতিহাসিক বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : নরেন্দ্র মোদী গত ২৯ মে এবিপি (নিউজ) কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন মহাত্মা গান্ধী একজন মহান মানুষ ছিলেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৭৫ বছর। গত ৭৫ বছরে দেশের দায়িত্ব ছিল বিশ্বের মানুষ যাতে মহাত্মা গান্ধীকে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। এরপরই মোদী বলেন 'আমাকে মাফ করবেন, তবে কেউ মহাত্মা গান্ধীকে চিনতেন না। রিচার্ড এটেনবরোর 'গান্ধী' ফিল্মটা তৈরি হবার পরই দেশ বিদেশের লোক তাঁর সম্পর্কে জানতে পারেন। মার্টিন লুথার কিং কে মানুষ চেনেন, নেলসন ম্যান্ডেলাকে মানুষ চেনেন। এই দেশের মানুষের কাজ ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজিকে তুলে ধরা। গান্ধী ও গান্ধীর মাধ্যমে দেশের কদর পাওয়া উচিৎ ছিল। আমরা সেই সুযোগ হারিয়েছি।'

মোদীর এই বক্তব্য সম্পর্কে রাহুল গান্ধী বলেন 'কোনও এন্টায়ার পলিটিকাল সায়েন্সের ছাত্রেরই (যা মোদীর ঘোষিত ডিগ্রি) মহাত্মা গান্ধীকে জানার জন্য ফিল্ম দেখার দরকার পড়ে। আরএসএস এর শাখায় যাদের দর্শন শিক্ষা হয় তাঁদের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বোঝা সম্ভব নয়।' রাহুল গান্ধী মনে করিয়ে দেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, নেলসন ম্যান্ডেলা , আলবার্ট আইনস্টাইনের মতন মানুষরা গান্ধীজির কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ছিলেন মহাত্মার অনুগামী।' তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ' বিজেপি এখন ইতিহাস বিকৃত করে মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকার দাবি করছে। সিপিআই (এম) এর সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেন 'নরেন্দ্র মোদীর জন্মের আগে গান্ধীজিকে অন্তত পাঁচ বার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু দেশের ব্রিটিশ শাসকরা এই পুরস্কার দিতে দেয় নি।'

আইনস্টাইন বলেছিলেন 'এই পৃথিবীর মানুষ একদিন অবাক হয়ে ভাববে , এই পৃথিবীর মানুষ একদিন অবাক হয়ে ভাববে , এই মাটিতে একজন রক্ত মাংসের মানুষ চলে ফিরে বেড়াতেন, তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।'

ইতিহাসের নথি ও পুরানো সংবাদপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি নিহত হবার বহু আগে থেকেই তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে অতি পরিচিত নাম। টাইম পত্রিকা তিনবার তাঁকে নিয়ে কভার স্টোরি করেছে। সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে গান্ধীজির মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি দেশ ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে। নরেন্দ্র মোদী সুকৌশলে গান্ধীজির ভাবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য এই প্রচার শুরু করলেন যে গান্ধীজিকে মানুষ চিনেছেন 'গান্ধী' ফিল্ম নির্মিত হবার পর। এই ফিল্ম নির্মিত হয়েছে ১৯৮২ সালে তিনি নিহত হবার অনেক পর। তাঁর হাতে 'গদি মিডিয়া' ছিল না। তাঁর ছিল 'হরিজন' ও Young India. স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিবেদিত।

গান্ধীজি কখনো নিজের ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন নি। গেরুয়া ভেক ধারণ করে মিডিয়াকে দিয়ে আত্মপ্রচার করতে যাননি। তিনি নিহত হবার পর সারা দেশ ও বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম এক আধারে অনেককিছু

মজিবুর রহমান

নজরুল ইসলাম যেমন বিদ্রোহী কবি তেমনি সাম্যবাদী কবি। তাঁর বিদ্রোহ বা বিরোধিতা ছিল সকল প্রকার অসাম্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তিনি সরাসরি বলেছেন, 'গাহি সাম্যের গান/যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।' নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য বা সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছেন। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, 'সাম্যের গান গাই/আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।/বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' আসলে সাহিত্যকে তিনি সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য প্রায় শতবর্ষ আগে লেখা কথাগুলো আজও বারবার উদ্ধৃত হয়ে থাকে। সেগুলো কখনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে না। এর দ্বারা অবশ্য তিনি নিজেকেই মিথ্যা প্রমাণ করেছেন; তিনি কেবল 'হুজুগের কবি' ছিলেন না। তিনি একজন কালোত্তীর্ণ কবি। তাঁর লেখার একটা চিরকালীন আবেদন রয়েছে।

নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিল, ঐক্য ও নৈকট্য বোঝাতে যে উপমা ব্যবহার করেছেন তার কোনো তুলনা হয় না, 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মোসলমান। মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।' তিনি যে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামির তীব্র বিরোধী ছিলেন। এজন্য মোল্লা-পুরুতদের একদম পছন্দ করতেন না। তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে ইসলামী গান গজলের পাশাপাশি সনাতনী গান শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গীতে ঈশ্বর-আল্লার বন্দনা মানব বন্দনায় রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি সবসময় মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। বারবার বলার চেষ্টা করেছেন, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম কখনও মানবিকতার থেকে বড় হতে পারে না, 'মিথ্যা শুনিনি ভাই,/এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

নজরুল ইসলাম শুধু সাহিত্যের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং বৃহত্তর জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। মুসলিম কাজী নজরুল ইসলামের হিন্দু আশালতা সেনগুপ্তকে তখনকার দিনে (এপ্রিল ১৯২৪) স্ব স্ব ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত কোনো মামুলি ব্যাপার ছিল না। পরস্পরের প্রতি তীব্র ভালোবাসার পাশাপাশি ধর্মীয় গোঁড়ামিকে অস্বীকার করার দৃঢ় মানসিক জোর না থাকলে দুই বিধর্মীর মধ্যে বিয়ে সম্ভব হত না। আশালতাকে মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রমীলা করে নজরুল সহধর্মিণীর সাহসকে কুর্নিশ জানান। নজরুল তাঁর সন্তানদের নামকরণেও ধর্মীয় মিলনের সন্ধান করেন। তাঁর চার পুত্র সন্তানের নাম ছিল ১. কৃষ্ণ মহম্মদ (জন্ম ও মৃত্যু-১৯২৫), ২. অরিন্দম খালেদ বুলবুল (১৯২৬-১৯৩০), ৩. কাজী সব্যসাচী ইসলাম (১৯২৯-১৯৭৯) ও ৪. কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম (১৯৩১-১৯৭৪)। সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ দুজনেরই হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়।

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মোসলমান। মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।' তিনি যে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামির তীব্র বিরোধী ছিলেন। এজন্য মোল্লা-পুরুতদের একদম পছন্দ করতেন না। তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে ইসলামী গান গজলের পাশাপাশি সনাতনী গান শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গীতে ঈশ্বর-আল্লার বন্দনা মানব বন্দনায় রূপান্তরিত হয়েছে।"

নজরুল ইসলাম খুব হাসিখুশি, আত্মভোলা, মজলিসি মানুষ ছিলেন। উচ্চ রবে হাসতে ভালোবাসতেন। আড্ডায় বসে মাঝে মধ্যেই বলে উঠতেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে।' কিন্তু এই প্রাণখোলা মানুষটি পুত্র বুলবুলের অকাল মৃত্যু মেনে নিতে

পারেননি। প্রচণ্ড শোকাহত হয়ে মানসিক শান্তি লাভের জন্য তন্ত্র সাধনা শুরু করেন। তবে এজন্য লেখালেখিতে কোনো খামতি ঘটেনি। ১৯৩৯ সালে প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার পর নজরুলের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। তাঁর মানসিক জোর কমে যায়। লেখনীতেও ভাটা পড়ে। তাঁর কণ্ঠে বিদায়ের সুর বাজতে শুরু করে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলী উৎসবে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, 'যদি আর বাঁশি না বাজে, আমি কবি বলে বলছিনে, আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি, আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম, সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নিরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলাম।'

১৯৪২ সালের ৯ জুলাই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান করার সময় তিনি অসুস্থবোধ করেন এবং তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে। কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি উন্নত চিকিৎসা করাতে পারেননি। সামান্য হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি চিকিৎসা করা হয় কিন্তু তাতে আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়নি। বরং অসুস্থতা আরও বাড়তে থাকে। তাঁর বাকশক্তি রদ হয়ে যায়। তিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হাঁটা চলা করতেও অসুবিধা হয়। এর ফলে নজরুল-প্রমীলার দুঃসহ কষ্টের জীবন শুরু হয়। তাঁদের সংসারে তখন নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। বাংলার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শনিবারের চিঠি পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, কলকাতার মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও শিক্ষাবিদ হুমায়ূন কবীর প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে 'নজরুল সাহায্য সমিতি' গঠন করা হয়। অসুস্থ হওয়ার এক দশক পর ১৯৫৩ সালে উন্নত চিকিৎসার জন্য কবিকে ইউরোপ পাঠানো হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেখানকার ডাক্তাররা জানিয়ে দেন, কবির আরোগ্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।

নজরুল ইসলাম সাধারণ মানুষের ভালোবাসার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারের কাছ থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছেন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মানপত্র পাঠ করেন ব্যারিস্টার এস ওয়াজেদ আলী, বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার দেয় পদ্মভূষণ পুরস্কার।

১৯৬২ সালের ৩০ শে জুন কবিপত্নী প্রমীলা দেবী প্রয়াত হন। নিজে শয্যাশায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভালোবাসার মানুষটির প্রতি সবসময় নজর রাখতেন। তাঁর জীবনাবসান হবার পর কবির সেবা শুশ্রূষায় অবহেলা ও অযত্ন বাড়তে থাকে। ১৯৭২ সালের ২৪ শে মে বাংলাদেশ সরকার কবিকে ঢাকা নিয়ে যায়। ধানমন্ডির একটি বাড়িতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাখা হয়। বাড়িটির নামকরণ করা হয় 'কবিভবন'। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষিত হন। কবির জীবনের শেষ তেরো মাস কাটে বাংলাদেশের পিজি হাসপাতালে। প্রায় ৩৪ বছর ধরে নির্বাক ও ভাষাহীন থাকার পর ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েন। কবির মরদেহ যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। কবির কফিন বহনকারীদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মোহাম্মদ সায়েম ও প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের ট্রাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'তুমি বাঁচিয়াও মরিয়া রহিলে দীর্ঘকাল/তুমি মরিয়াও বাঁচিয়া রহিবে চিরকাল।'

ঋণ-স্বীকার ১.নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন, সম্পাদনা- কল্যাণী কাজী ও প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, ২.শত কথায় নজরুল, সম্পাদনা- কল্যাণী কাজী।

(শেষ)

নেহরু ও প্যাটেল

শুভাশিস মজুমদার

২৭ মে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ষাটতম মৃত্যুবার্ষিকী। এই লেখাটিতে নেহরুর রাজনৈতিক কর্মজীবনের একটি মূল দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর (নেহরুর) সহযোগিতা ও সম্মানজনক সম্পর্ক।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতার পরে প্রথম দিকে এই দুই ব্যক্তি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের কাজ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ এসেছে, ঠিক যেমন, যে কোনো দুই সহকর্মী একসাথে কাজ করলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের সম্পর্ককে সামগ্রিকভাবে দেখলে দেখা যাবে, তাঁদের স্বতন্ত্র নিজস্ব গুণ বা শক্তিকে একত্রিত করে তাঁরা দেশের সেবায় নিয়োগ করেছিলেন, যাকে তাঁরা উভয়ই গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাঁরা ছিলেন অপরিহার্যভাবে পরস্পরের পরিপূরক যা নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দলের সহকর্মীরা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা নেহরুকে হেয় করার জন্য প্যাটেলের নাম ব্যবহার করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করেন না।

ব্রিটিশরা যখন আমাদের শাসন করছিল, তখন নেহেরু এবং প্যাটেল কংগ্রেসকে ভারতীয় সমাজের বেশিরভাগ অংশের প্রতিনিধিত্বকারী গণসংগঠনে পরিণত করতে সাহায্য করেছিলেন। দু'জনেই বহু বছর জেলে কাটিয়েছেন। তবুও সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় তাঁদের কাজ। বৃটিশরা এই ভূখন্ডকে বিভাজিত ও বেহাল দশায় রেখে যায়। গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে, অভাব এবং বেকারত্ব; বর্ণ, শ্রেণী এবং লিঙ্গের গভীর বৈষম্য; পাঁচশত দেশীয় রাজ্যের একত্রিকরণ করা; কয়েক মিলিয়ন শরণার্থীর পুনর্বাসন করার সমস্যা। সম্ভবত, সদ্য স্বাধীন হওয়া কোনও নতুন জাতি এর থেকে অধিক অনুপযুক্ত পরিস্থিতির শিকার হয়নি। তবুও দেশটি ঐক্যবদ্ধ ছিল, এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছিল, তা ছিল অনেক উল্লেখযোগ্য দেশপ্রেমিকদের অবদান, যাঁদের মধ্যে সম্ভবত নেহরু এবং প্যাটেল ছিলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি তৈরিতে নেহরু এবং প্যাটেলের অবদানগুলি রামচন্দ্র গুহর বই 'ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী'-তে ও তাঁর অন্যান্য রচনাগুলিতেও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজমোহন গান্ধী রচিত প্যাটেলের জীবনীতেও বর্ণিত হয়েছে এই অবদান। নেহেরু মহিলাদের এবং জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারের আশ্বাস দিয়ে ভারতের মানসিক সংহতির বা একাত্মকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। নেহরু তরুণদের কাছে একজন অনুপ্রেরণামূলক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্যাটেল দেশীয় রাজা ও নবাবদের শাসিত রাজ্যগুলিকে একত্রে এনে ভারতের আঞ্চলিক একত্রিকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি সিভিল সার্ভিসের সংস্কারে এবং সংবিধান রচনায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ইতিহাস বলছে, ভারতীয়রা এতটাই ভাগ্যবান ছিল যে, আমাদের জাতিসত্তার সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরা প্রথম বছরগুলিতে নেহরু এবং প্যাটেল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে, তাঁরা প্রায়শই একে অপরের প্রতি তাঁদের বিশাল শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্যাটেল তাঁর একজন কনিষ্ঠ সহকর্মীকে লেখেন, 'আমার এবং জওহরলালের বিচ্ছেদের বিষয়ে আপনি যে ভুল ধারণা পোষণ করছেন তা পরিষ্কার করার জন্য জানাই, বিষয়টিতে একেবারেই কোনো সত্যতা নেই...অবশ্যই, আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে, যেমন সব সৎ ব্যক্তির মধ্যেই থাকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রশংসা এবং আত্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে।' এক বছর পরে, নেহরুর ৬০ তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, প্যাটেল লিখেছিলেন, 'এরকম ঘনিষ্ঠ এবং বৈচিত্র্যময় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে একে অপরকে জানার ফলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের প্রতি অনুরাগী হয়েছি; আমাদের পারস্পরিক স্নেহ যত সময় গেছে ততই বেড়েছে, এবং আমাদের সমস্যা এবং অসুবিধাগুলি সমাধান করার সময় যদি আমরা আলাদা থাকি এবং একসাথে পরামর্শ করতে

না-পারি তাহলে আমরা একে অপরের কতটা অভাব বোধ করি তা মানুষের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন।'

এই প্রশংসার প্রতিদান দিয়েছিলেন নেহরু ১৯৪৭ সালের আগস্টে। নেহরু প্যাটেলকে 'মন্ত্রিপরিষদের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ' বলে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তিন বছর পরে, প্যাটেল মারা গেলে নেহরু তাঁর প্রয়াত বন্ধু এবং সহকর্মীর উদ্দেশে বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের বাহিনীর একজন মহান অধিনায়ক এবং এমন একজন যিনি আমাদের কষ্টের সময় এবং বিজয়ের মুহূর্তে সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন...'।

"ইতিহাস বলছে, ভারতীয়রা এতটাই ভাগ্যবান ছিল যে, আমাদের জাতিসত্তার সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরা প্রথম বছরগুলিতে নেহরু এবং প্যাটেল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন।"

প্যাটেলের 'অতুলনীয় সাহস, শৃঙ্খলার অদম্য বোধ, এবং সাংগঠনিক প্রতিভা'র কথা উল্লেখ করে নেহরু বলেছিলেন, 'যেভাবে তিনি (প্যাটেল) দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কঠিন এবং জটিল সমস্যা সমাধান করেন তাতে তাঁর প্রতিভা বিশেষ করে প্রকাশ পায়। একটি অখন্ড ও শক্তিশালী ভারত গঠনে তিনি তাঁর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন এবং দক্ষতা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে তা অর্জন করতে শুরু করেন। দ নেহেরু তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি এই বলে শেষ করেছিলেন '(প্যাটেলের) উজ্জ্বল উদাহরণ, কর্তব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর অটলতা, তাঁর শৃঙ্খলাবোধ, দেশের মানুষের অনুসরণ করা উচিৎ; এবং স্বাধীন, শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভারত, যার জন্য তিনি পরিশ্রম করেছেন, ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তা উপলব্ধি করা (কর্তব্য)।' ঐতিহাসিক নথিতেই রয়েছে, কিভাবে নেহরু এবং প্যাটেল স্বাধীনতার আগে এবং পরে সহযোদ্ধা এবং সহকর্মী ছিলেন। তাহলে কি করে আজ জনসাধারণের সামনে তাঁদের পরস্পরকে প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে?

ভারতীয় বিজ্ঞান-দর্শন চর্চার পথিকৃত অক্ষয়কুমার দত্ত

নারায়ণ দেব

অক্ষয়কুমার দত্তের আপোসহীন যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণস্বরূপ তাঁর ১৮৫৪ সালের প্রার্থনা-ইকুয়েশন সংক্রান্ত ঘটনাটির অবতারণা করা হচ্ছে।

১৮৫৪ সালে একবার হিন্দু হস্টেলের একদল ছাত্র নানা প্রকার কর্মোদ্যমে প্রার্থনার উপযোগিতা নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রশ্ন করে। ওই প্রশ্নের উত্তরে অক্ষয় দত্ত উদাহরণস্বরূপ তাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়?' তারা একবাক্যে বলে, 'শস্য'। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনাও করে, তাহলে কি পাবে?' ছাত্ররা আবার সমস্বরে বলে ওঠে, 'শস্য'। তখন তিনি বলেন, 'তাহলে প্রার্থনা করার জন্য কৃষক বাড়তি কিছু পেল কি?' ছাত্ররা বলল, 'না'। অক্ষয় দত্ত এবার বললেন, 'অতএব প্রার্থনার মূল্য শূন্য।' এই দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা নীরব হয়ে যায়।

অতঃপর তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে প্রার্থনার শক্তি যে শূন্য তা দেখান

পরিশ্রম= শস্য

পরিশ্রম+প্রার্থনা= শস্য

অতএব, প্রার্থনা= ০

ছাত্ররা এই উপস্থাপনার নাটকীয়তায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। তাদের মুখে মুখে এই সমীকরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে তৎকালীন শিক্ষিত মহলে প্রচুর আলোড়ন জাগে। অনেকেই অসন্তুষ্ট হন, যেমন স্বনামধন্য ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু। 'এই ঘটনার দুই দিবস পরে মেডিক্যাল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে (অক্ষয়বাবুকে) বলিলেন, 'আপনি ভাল এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।' অক্ষয়বাবু উত্তর করিলেন, 'বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধ-সুলভ, তাহা এদেশীয় লোকদের নূতন বোধ হইল এটি বড় দুঃখের বিষয়।'

পাঠক লক্ষ্য করবেন, বস্তুত ওই ইকুয়েশনের মধ্যে নয়, অক্ষয়কুমারের এই মন্তব্যের মধ্যেই তাঁর সত্যিকারের স্বাতন্ত্র্যের চিত্রটি ফুটে ওঠে। ভাবতে কিছুটা অবাক লাগে যে আজ থেকে ১৭০ বছর আগে এমন একজন বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ আমাদের এই দেশে ছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য 'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারুপাঠ' (তিন খণ্ড, ১৮৫৩-১৮৫৯), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) নামে তিনটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম খণ্ড, ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) গ্রন্থটি তাঁর বিপুল অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পরিচয় বহন করে। এছাড়া, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত তৎকালের জনপ্রিয় সাময়িক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘকাল পালন করেছিলেন।

তথ্য সূত্র শ্রীআশীষ লাহিড়ি প্রণীত পুস্তক 'অক্ষয়কুমার দত্ত আঁধার রাতে একলা পথিক

শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত থামেনি

আকবর হোসেন

খাগড়াছড়ির দীঘিনালার বাসিন্দা দীপঙ্কর প্রসাদ চাকমা ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখার সদস্য। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখাটি শান্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল। দীপঙ্কর প্রসাদ চাকমার মতো শান্তিবাহিনীর বহু সদস্য ১৯৮০ এবং ৯০-এর দশকে পাহাড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে লড়াই করেছিলেন। তাদের প্রায় দুই দশকের সশস্ত্র লড়াইয়ের ইতি হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ২রা জুলাই এক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। সে চুক্তির দুই মাস পরে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল শান্তি বাহিনীর সদস্যরা। এরপর শান্তি বাহিনীর সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিও দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে যোগ দেয়।

চুক্তিতে কী ছিল?

শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে স্বাক্ষর করেন তাদের নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, যিনি সন্তু লারমা হিসেবে পরিচিত। অস্ত্র সমর্পণের পর শান্তিবাহিনীর প্রায় দুই হাজার সদস্যের প্রত্যেককে সরকার ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিল। এছাড়া শান্তি বাহিনীর সাতশর বেশি সদস্যকে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়।

সে চুক্তিতে পাহাড়িদের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। চুক্তির মোদ্দা কথা কথা ছিল, পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং সে জন্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছিল।

এর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে

১. তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। উপজাতীয় আইন এবং সামাজিক বিচারকাজ এই পরিষদের অধীনে থাকবে।

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা

৩. উপজাতীয়দের ভূমি মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা।

বাস্তবায়ন কতটা?

শান্তি চুক্তির ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সেই অঞ্চলে গঠন করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার জনসংহতি সমিতি বলছে, প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে বটে কিন্তু সেগুলোর হাতে ক্ষমতা নেই। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এই প্রতিষ্ঠানটি কার্যত নিষ্ক্রিয় রয়েছে। জেলা পরিষদগুলোর উপর আঞ্চলিক পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার বলেন, যদিও কিছু বিষয় বাস্তবায়ন হয়েছে, কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন হয়নি। সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন ও পরিবেশ; এই সব বিষয় জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের হাতে থাকার কথা। ততাহলে এ থেকে বুঝতে পারেন আমরা কী পেলাম? প্রশ্ন তোলেন উষাতন তালুকদার।

ভূমি বিরোধ মিটছে না

জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি লাখের বেশি বাঙালিকে পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী বসবাসের জন্য মিয়ে যান। পাহাড়িদের ভাষায় তারা 'সেটেলার'। শান্তি বাহিনীর সাথে সেনাবাহিনীর সংঘাত চলার সময় বহু পাহাড়ি ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেকে পার্বত্য এলাকার ভেতরেই উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। পাহাড়িদের অভিযোগ হচ্ছে, ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত যেসব বাঙালিকে পার্বত্য এলাকায় আনা হয়েছিল তাদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল পাহাড়িদের জমিতে। পাহাড়িদের দাবি হচ্ছে, সেসব 'সেটলারদের' কাছ থেকে জমি নিয়ে পাহাড়িদের ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বাঙালিরা বলছেন তাদের কাছে জমির বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শান্তি চুক্তি হবার দুই বছর পরে 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন' গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশনের কাছে এখন প্রায় ১৬ হাজারের মতো আবেদন জমা পড়ে আছে। কিন্তু গত ২৩ বছরে এই কমিশন কোন কাজই করতে পারেনি। খাগড়াছড়ি শহরে এই কমিশনের অফিসে গিয়ে দেখা যায় সেখানে কোন কর্ম তৎপরতাও নেই। ২০১৬ সালের পর থেকে এই কমিশন আর কোন আবেদনও গ্রহণ করেনি। পাহাড়িদের বক্তব্য, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে এখানকার পরিস্থিতি অশান্ত থেকেই যাবে। তবে বাঙালিরা বলছেন, এই কমিশন নিরপেক্ষ নয়। খাগড়াছড়ির সাবেক এমপি এবং বিএনপি নেতা ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেন, এই কমিশনে বাঙালিদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। একমাত্র বাঙালি হচ্ছেন চেয়ারম্যান। বাকি সবাই উপজাতি। তাহলে বাঙালিরা কিভাবে ন্যায়বিচার পাবে? তাঁর বক্তব্য, ত্বাঙালিরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে গেছে। এখানে আপনি জমি কিনে কিছু করতে পারবেন না। আপনি যদি খুলনায় গিয়ে, রংপুরে গিয়ে বাড়ি কিংবা ব্যবসা করতে চান সেটা বাংলাদেশের সংবিধান অ্যালাউ করেছে। পার্বত্য এলাকায় এটা হয়ে গেল উল্টো।

চুক্তির সুফল কতটা?

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে সে অঞ্চলে অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতেও উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে পার্বত্য এলাকায়। শান্তি চুক্তির পরে গত ২৫ বছরে পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক পর্যটন বেড়েছে। এর ফলে স্থানীয় পাহাড়ি এবং বাঙালি উভয়েই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। বাংলাদেশের যে কয়েকটি জায়গায় পর্যটকরা সবচেয়ে বেশি বেড়াতে যান তার মধ্যে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান অন্যতম। শান্তিচুক্তি না হলে এটি কখনোই সম্ভব হতো না।

সুনীল দে রাঙামাটিতে সাংবাদিকতা করেন ৪০ বছরের বেশি সময় যাবত। তিনি বলেন, এমনও অবস্থা গিয়েছে, সকাল কয়টার পরে আমি বের হতে পারবো, বিকেল কয়টার আগে আমাকে হিলট্র্যাকসে ঢুকতে হবে, আদৌ ফিরতে পারবো কিনা কোন গ্যারেন্টি নাই। এগুলো করেই আমাদের চলাফেরা করতে হয়েছে। এই অবস্থা যখন ছিল তখনই এই চুক্তির কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগেও কয়েকবার এই চুক্তির কার্যক্রম শুরু হলেও শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আসার পর সেটি আলোর মুখ দেখে। ওই আমলে প্রথমবারের মতো এ বিষয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয় বলে তিনি জানান।

দল, উপদল এবং কোন্দল

শান্তি চুক্তির পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জটিল এক রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথেই এর বিরোধিতা করে তৈরি হয়েছিল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ। বর্তমানে ইউপিডিএফ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দুটো করে গ্রুপ রয়েছে। এরা সবাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ। গত কয়েক বছর যাবত এসব সংগঠন একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত। নিত্যদিন খুনোখুনি হচ্ছে। অবৈধ অস্ত্র এবং চাঁদাবাজি এখন সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে পাহাড়ে। স্থানীয় ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম বিবিসিকে বলে, তআমাদের দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রুপকে চাঁদা দিতে দিতে আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি।

পাহাড়ে বিভিন্ন উপদল তৈরি হবার পেছনে নিরাপত্তা বাহিনীর বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করেন অনেকে। বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে পাহাড়ে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে

পাহাড়ি নেতাদের অভিযোগ। নানা গ্রুপিং এবং উপদলের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমার প্রভাব কিছুটা খর্ব হয়েছে। ইদানীং তাকে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেও খুব একটা দেখা যায় না। সংবাদমাধ্যমকেও এড়িয়ে চলেন মি. লারমা। বিএনপি নেতারা চুক্তির বিপক্ষে কথা বলছেন। আওয়ামী লীগ নেতারা চুক্তির বিপক্ষে কথা না বললেও তারা সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির সমালোচনা করছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে যেসব হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার মধ্যে আওয়ামী লীগে কিছু নেতা-কর্মী রয়েছে বলে উল্লেখ করেন রাঙামাটির সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা দীপঙ্কর তালুকদার। এজন্য তিনি সরাসরি জেএসএসকে দায়ী করে। মি. তালুকদার বলেন, শান্তি চুক্তি সাধিত হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। আর জনসংহতি সমিতি চায় আওয়ামী লীগ নিশ্চিহ্ন করতে। জনসংহতি সমিতি যদি আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, তাহলে চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন কাকে দিয়ে? তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের শেকড় এখানে অনেক গভীরে। এটাই জনসংহতি সমিতির মাথা ব্যথার কারণ। স্বাভাবিক কারণে এখানে তো বিশ্বাস আস্থান সংকট তৈরি হয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে জনসংহতি সমিতির অনেক সদস্য চাঁদাবাজি এবং খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মি. লারমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এবং জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার সে কথা অস্বীকার করেন।

রাঙামাটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, তসরকারের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন আমরা অস্ত্র গোলাবারুদ পুরোপুরি জমা দেই নাই। আমি বুকে হাতে দিয়ে হলফ করে বলতে পারি আমরা একটা বুলেটও রেখে আসি নাই। চুক্তি বিরোধীরা আমাদের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মারধর ও খুন করেছে। তাহলে সমাধান হবে না?

আওয়ামী লীগ নেতা ও এমপি দীপঙ্কর তালুকদার ২০০৯ সালে থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি মনে করেন, কোন চুক্তি শতভাগ বাস্তবায়ন করা না গেলেও সবগুলো পক্ষ কিছুটা ছাড় দিলে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, এমন চুক্তি বাস্তবায়ন কখনো হয় নাই। উভয় পক্ষ যদি অনমনীয় থাকে তাহলে সমস্যার সমাধান কখনো হয় না। জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার বলেন, বল প্রয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে না।

এটা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, তআমাদের মনে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। আমরা এক পায়ে খাড়া আছি। অস্ত্রবাজি দমন করার ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব। সরকার সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসুক, আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করবো।

বিবিসি নিউজ বাংলা (২. ১২. ২০২২) থেকে পুনর্মুদ্রিত

দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

এ পর্যন্ত 'নাগরিক' প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। গত ৬ মে 'নাগরিক'-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ, ৩ জুন সাপ্তাহিক পর্যায় শেষ হল। এরপর থেকে 'নাগরিক' প্রকাশিত হবে মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার।

পরের প্রকাশ ১৭ জুন।